HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট
টপিক ০২: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা
টপিক ০৩: পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা
টপিক ০৪: বাঙালি জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ
টপিক ০৫: মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাত্রদের অংশগ্রহণ
টপিক ০৬: মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ
টপিক ০৭: মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ
টপিক ০৮: মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহন
টপিক ০৯: বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা
টপিক ১০: প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন
টপিক ১১: মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

পাকিস্তানের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক শাসনের অবসান ঘটিয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। এই রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭সালে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির সময় বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি উঠেছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের তখনকার দুই প্রধান দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ- উভয় সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার বিরোধিতায় বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এদিকে বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে পাকিস্তানের শাসক এবং পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে শুরু থেকেই এক ধরনের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। এরূপ অবস্থায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির বাহক পাকিস্তানের দুই অংশের নেতাদের উচিত ছিল সমতাভিত্তিক নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকরা এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা ও শোষণের নীতি গ্রহণ করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অচিরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বাঙালিদের মোহভঙ্গ হতে থাকে। ক্রমে সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটে। এ চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৯৬৬ সালের ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। পতন হয় সামরিক শাসক আইয়ুব খানের। এরপর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া জয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে গড়িমসি শুরু করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

প্রতিবাদে গর্জে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। কিন্তু সামরিক সরকার তাতে কর্ণপাত না করায় বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার ডাক দেন। ৭মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সভায় (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তিনি প্রায় দশ লাখের বেশি মানুষের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আন্দোলনের চাপে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সমঝোতার জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেন। কিন্তু এ আলোচনা ছিল প্রহসন। কেননা আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক সেনা ও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম পূর্ব পাকিস্তানে আনা হচ্ছিল। চলছিল স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন আলোচনার জন্য। ২২ মার্চ আসেন নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। বঙ্গবন্ধু ও তার প্রতিনিধি দলের সাথে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে আলোচনা শুরু হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

এদিকে ১৯ মার্চ থেকে সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করা শুরু হয়। বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করার জন্য কৌশল হিসেবে ২০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের অস্ত্র জমাদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই দিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ইয়াহিয়া খান তার উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। জেনারেল টিক্কা খানসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া খান কুখ্যাত Operation Search Light-এর অনুমোদন দেন। প্রসঙ্গত, ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঢাকায় পরিচালিত গণহত্যা অভিযানেরই সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'।

ইতিমধ্যে ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে তার বাসভবনে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। সারা বাংলাদেশেই এদিন পাকিস্তানের পতাকার বদলে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা তোলা হয়। এদিকে প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পিআইএ ফ্লাইটে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও রসদ আনা হয়। সারাদেশে ছিল চাপা উত্তেজনা ও আশঙ্কা। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাসের খবর ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ বন্দর এলাকা ঘেরাও করে রাখে। এভাবে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এ দেশবাসীর স্বাধীনতার দাবি স্তব্ধ করে দিতে ২৫ মার্চ মধ্যরাতকে বেছে নেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পেক্ষাপট

সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পুরনো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানায় ইপিআর (পরে বিডিআর তার পর বিজিবি) বাহিনীর দপ্তরসহ বিভিন্নস্থানে ভারি অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পুলিশ, ইপিআর জওয়ান, বস্তিবাসীসহ শত শত মানুষকে হত্যা করে হানাদার সেনারা। তবে রাজারবাগে পুলিশ সদস্যরা বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সারা রাত লড়াই চালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে ঢাকার বিভিন্ন স্থান। শহরটি রাতারাতি পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

২৫ মার্চ রাতের নৃশংস গণহত্যা শুরু হওয়ার বিষয় জানতে পেরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয় সেনারা। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার। এ সরকারের পরিচালনায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত করা হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০২ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন ঢাকায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু করে বঙ্গবন্ধু তখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর' (অর্থাৎ ২৬ মার্চের শুরু) পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে তিনি টিএন্ডটি ও ইপিআরের (বর্তমান বিজিবি) ওয়ারলেসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পৌছে দেন।'

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে অর্থাৎ ২৫ তারিখ দিবাগত রাত ২টার দিকে ইপিআর অফিস থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী চট্টগ্রামের স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট ইউনুস আলীকে দেওয়া হয়। তারা জানান, রাত সোয়া একটায় ইপিআরের ওয়ারলেস যন্ত্রে এ বার্তা পাওয়া যায়। বার্তাটি ছিল নিম্নরূপ:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

Declaration of Independence of Bangladesh

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman

26 March, 1971."

বাংলা অনুবাদ

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যেখানে আছো, যাহার যাহা কিছু আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার বার্তাটি চট্টগ্রাম ওয়ারলেস বিভাগ সে রাতেই চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে পৌঁছে দেয়। তিনি এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নান এ স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তার বঙ্গানুবাদ করেন। সে রাতেই তা সাইক্লোস্টাইল কপি করে চট্টগ্রাম শহরের জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং মাইকযোগেও তা প্রচার করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেসযোগে দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেওয়ার পরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নুরুল উল্লার এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ৭ মার্চের পর বঙ্গবন্ধু তাকে ডেকে পাঠান। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতারা এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তাদের আলাপচারিতার সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদও উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু এসময় অধ্যাপক নুরুল উল্লাকে বলেছিলেন, “নুরুল উল্লা, আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরি করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরি রাখবে, আমি শেষবারের মতো ভাষণ দিয়ে যাব।"

ড. নুরুল উল্লা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কথা তড়িৎকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষকদের জানান। সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের প্রথম রেডিও ট্রান্সমিটার তৈরির কাজ। বিভাগীয় প্রধান ড. জহুরুল হকসহ প্রায় সব শিক্ষক ৯ দিন কাজ করার পর একটি ট্রান্সমিটার তৈরি করতে সক্ষম হন। এর সম্প্রচার ক্ষমতা ছিল প্রায় বাংলাদেশব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখনের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৯৭০ সালেই বঙ্গবন্ধু আখাউড়া শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি লালমিয়া ও গঙ্গাসাগরের গোলাম রফিককে একটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করার উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ভারতে পাঠিয়েছিলেন।

মওদুদ আহমদের এক লেখা থেকে জানা যায়, ২৫ মার্চ রাত ১২টা ৫০ মিনিটে তিনি বঙ্গবন্ধুর বাসায় টেলিফোন করলে হাজি মোর্শেদ নামে এক ব্যক্তি ফোনটি ধরেন। তিনি হাজি মোর্শেদকে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর তৎপরতার কথা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেন। কিন্তু হাজি মোর্শেদ জানান, 'বঙ্গবন্ধু পালাতে অস্বীকার করেছেন।' ১টা ১০ মিনিটে মওদুদ আহমদ আবারও ফোন করলে কেউ ফোন ধরেনি। সুতরাং ধরা যায়, বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়েছিলেন ২৬ মার্চ রাত ১টা বা তার কাছাকাছি সময়ে। হাজি মোর্শেদ জানান,

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

"রাত ১১টা থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় অসংখ্য টেলিফোন তিনি নিজেই 'রিসিভ' করেন। প্রায় সকলেই একই বার্তা বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠাতে চেষ্টা করেন, সেটা হলো পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্যাঙ্ক, কামানসহ রাস্তায় নেমে পড়েছে, বঙ্গবন্ধু যেন তার বাসভবন ত্যাগ করেন। কিন্তু রাত ১১টার পরে বলধা গার্ডেন বা তার কাছাকাছি কোনো এক জায়গা থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি টেলিফোন করে বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চায়, 'মেসেজটি পাঠানো হয়ে গেছে, বেতার যন্ত্রটি কোথায় লুকাবো'?"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক বেলাল মোহাম্মদ তার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন।, বেলাল মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সুলতান আলী, তিনি ও অন্যান্যের সাথে আলোচনার পর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বেতারে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৬ মার্চ দুপুর প্রায় ২টা ৩০ মিনিটে এম. এ. হান্নান নিজে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে (আগ্রাবাদ) সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।' ঐদিন সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মতৎপরতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ স্বাধীনতা-সম্পর্কিত ঘোষণার বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

এরপর মূল ইংরেজি ভাষণ পাঠ করেন ওয়াপদার তৎকালীন প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম। এরপর জনাব আবদুল হান্নান আবার বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচার করেন।

সাংবাদিক আতাউস সামাদ ২৫ মার্চ রাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে যান। বাড়ির লাইব্রেরি কক্ষে বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি কথা বলেন, বঙ্গবন্ধু তাকে বলেন আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিলাম, এখন যাও, সেটা রক্ষা করো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৩ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ সাধারণ জনগণের ওপর ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫ মার্চ সারা দিনজুড়ে ঢাকায় ছিল থমথমে অবস্থা। জনমনে বিরাজ করছিল চাপা আশঙ্কা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যরাতে আক্রমণের কথা ছিল। কিন্তু শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা রাও ফরমান আলী আক্রমণের সময় এগিয়ে আনেন। রাত সাড়ে এগারোটার দিকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল রাজারবাগ পুলিশলাইন, পিলখানার ইপিআর সদরদপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ফার্মগেট এলাকায় মিছিলরত ছাত্র-জনতা। নির্বিচারে গুলিবর্ষণ আর ট্যাঙ্কের গোলায় সেখানে অনেক হতাহত হয়। প্রায় একই সাথে আক্রান্ত হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানা। বাঙালি পুলিশ এবং ইপিআর সদস্যরা তাদের সীমিত অস্ত্র দিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। কিন্তু ট্যাংক ও কামানসহ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভারি অস্ত্রের মুখে তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। রাজারবাগ ও পিলখানায় কয়েকশ পুলিশ ও বাঙালি জোয়ান লড়াই করে শহিদ হন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

প্রতিবাদ-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চালানো হয় নৃশংস আক্রমণ। ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এবং জগন্নাথ হল আক্রমণ করা হয় রকেট লঞ্চার দিয়ে। হলগুলো সেনাসদস্যরা ঘিরে থাকায় সেখানে থাকা কোনো ছাত্রই বের হতে পারেনি। পাকিস্তানি সেনারা হলের প্রতিটি কক্ষ তল্লাশি করে এবং আহতসহ যাকে সামনে পায় গুলি বা বেয়নেট চার্জ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, আক্রমণের প্রথম দিকে ইকবাল হল *থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেলের পাল্টা গুলির আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। সে রাতে বেঁচে যাওয়া হলকর্মী জলিলের বক্তব্য থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খুঁটিনাটি তথ্য জানা যায়। ২৬ মার্চ ভোরে দেখা যায় জগন্নাথ ও ইকবাল হলের কক্ষ, সিঁড়ি, মাঠ ও পাশের রাস্তায় লাশ আর লাশ। ভোর ৪টা পর্যন্ত হলগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডব চলে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলেও হানা দেয়। তারা অনেক ছাত্রীকে পাশবিক নির্যাতনের পর হত্যা করে। অনেক ছাত্রীকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে যায়।
পাকিস্তানি হানাদার সেনারা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিশিষ্ট শিক্ষককেও হত্যা করে। শ্রীমতি বাসন্তী রাণী গুহ ঠাকুরতার বিবরণ থেকে জানা যায়, সে রাতের হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স কোয়ার্টারে শহিদ হন গোবিন্দচন্দ্র দেব, ড. মনিরুজ্জামানসহ আরো কয়েকজন এবং জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা গুলিতে আহত হন। তিনি ৩০ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। কিন্তু এই শিক্ষকের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি, যা মেডিকেলের বারান্দায় ৩ এপ্রিল পর্যন্ত পড়েছিল।১০ হত্যা করা হয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আড্ডার প্রাণকেন্দ্র মধুর ক্যান্টিনের মধুদা'কে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

পাকিস্তানি হানাদার সেনারা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিশিষ্ট শিক্ষককেও হত্যা করে। শ্রীমতি বাসন্তী রাণী গুহ ঠাকুরতার বিবরণ থেকে জানা যায়, সে রাতের হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স কোয়ার্টারে শহিদ হন গোবিন্দচন্দ্র দেব, ড. মনিরুজ্জামানসহ আরো কয়েকজন এবং জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা গুলিতে আহত হন। তিনি ৩০ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। কিন্তু এই শিক্ষকের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি, যা মেডিকেলের বারান্দায় ৩ এপ্রিল পর্যন্ত পড়েছিল।১০ হত্যা করা হয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আড্ডার প্রাণকেন্দ্র মধুর ক্যান্টিনের মধুদা'কে।

ঘাতক পাকিস্তানি সেনারা ২৫ মার্চ রাতে পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা তাঁতিবাজার, শাঁখারি পট্টি এবং কচুক্ষেত, মিরপুরের বিভিন্ন এলাকা, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, ইন্দিরা রোড, কলাবাগান এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা-লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা এ রাতে ঢাকার বাইরেও রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুমিল্লা, সৈয়দপুরসহ পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে হামলা চালায়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

পাকিস্তান বাহিনীর এক প্লাটুন সেনা মধ্যরাতে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ করে। হানাদার সেনারা স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করে চিৎকার করে বঙ্গবন্ধুকে বেরিয়ে আসতে বলে। বঙ্গবন্ধুর কক্ষ এসময় বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে প্রহরীদের হত্যা করে তালা ভেঙে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতাকে প্রথমে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত আদমজি স্কুলে এবং পরদিন ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে রাখা হয়। পরে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দি রাখা হয়।

২৫ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ চলে। এ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের খবর যাতে বহির্বিশ্বে পৌছতে না পারে, সেজন্য পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ মার্চের আগেই বিদেশি, সাংবাদিকদের ঢাকা ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তারপরও ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিংসহ কয়েকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকায় লুকিয়ে ছিলেন। ব্রিটেনের The Daily Telegraph পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের চালানো গণহত্যার খবর জানিয়েছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাইমন ড্রিং। তার বর্ণনা অনুযায়ী, শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের হল হওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী জগন্নাথ হল পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। এতে ৬০০ থেকে ৭০০ আবাসিক ছাত্র এবং অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, মনিরুজ্জামান প্রমুখ নিহত হন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

সারি সারি লাশ

২৫ মার্চ নিহত নিরীহ রিকশাওয়ালা ও আরোহী

রায়ের বাজার বধ্যভূমি

২৬ মার্চ সকালে পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি দলের নেতা ভুট্টোকে হোটেল থেকে বের করে সামরিক প্রহরায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতের এই নৃশংস সামরিক অভিযানের ফলাফল দেখে ভুট্টো সামরিক বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ। পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' এরপর তাকে নিরাপদে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শুধু ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েক হাজার নারী-পুরুষ-শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এটি ছিল এক ভয়ংকর গণহত্যার শুরু মাত্র। পরবর্তী ৯ মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অভিযান চালিয়ে এদেশের নারী-পুরুষ-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যাকেই সন্দেহ হয়েছে নির্বিচারে হত্যা করেছে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষেরা ছিল তাদের চোখে চরম শত্রু। বাংলাদেশে ৯ মাসে পাকিস্তানিদের হাতে ৩০ লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়। গণহত্যা বিষয়ে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ লিও কুপার তার সাড়াজাগানো 'জেনোসাইড' বইটিতে এ সংখ্যার উল্লেখ করে বলেছেন, মাত্র নয় মাসে এত লোককে হত্যা করা হয়েছিল। এটি বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা। ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ দখলদার মার্কিন সেনারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'মাই লাই' গ্রামে যে গণহত্যা চালায় তা দেখে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছিল। আর বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে নির্বিচার হত্যা-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ চালিয়েছিল তা দেখে পশ্চিমা গণমাধ্যম শিরোনাম করেছিল,
'Bangladesh- A Thousand My Lai' |

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৪ বাঙালি জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

বাঙালি জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাঙালি জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের ধারণা ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনার পর, ১০ এপ্রিলের মধ্যেই পুরো পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) তার নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তার এ আশাবাদের কারণও ছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম দিককার অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন প্রতিরোধ সহজেই ভেঙে পড়েছিল। তাছাড়া পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার হত্যা-লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ-ধর্ষণের মুখে টিকতে না পেরে দলে দলে লোক সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে। কিন্তু টিক্কা খানের আশাকে হতাশায় পরিণত করে এপ্রিলের শুরুর দিকেই মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের নির্দেশনায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। কার্যত ২৬ মার্চ থেকেই বাঙালিদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঢাকার ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার খবর পাওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বাঙালি সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকেন। কেউ কেউ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কয়েকটি স্থানে বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ঘটনা ঘটে। তবে প্রথম দিকে কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে।

বাঙালি জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

এপ্রিল মাসের বেশির ভাগ সময় দেশের অধিকাংশ স্থান স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামীরা পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। এ সময় বিভিন্ন সরকারি অস্ত্রাগার, যেমন- রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি, থানা, ট্রেজারি প্রভৃতি স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং বাড়িতে থাকা লাইসেন্স করা ব্যক্তিগত বন্দুক, রাইফেল নিয়ে প্রতিরোধ প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কোথাও কোথাও ডামি কাঠের রাইফেল দিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলে। অনেক স্থানে রাস্তা কেটে কিংবা বড় বড় কাঠের গুড়ি ফেলে ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী সহজে চলাচল করতে না পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৫ মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্রসমাজ একটি বিশেষ স্থান তৈরি করে নেয়। পরবর্তী সময়ে এদেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের আহ্বান জানানোর পর শীর্ষ ছাত্রনেতারা 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। দেশের সব জেলায়, প্রতিটি স্কুল-কলেজে 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় কলেজের ছাত্ররা এলাকার শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবীদের সংগঠিত করতে থাকেন। তারা বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র প্রশিক্ষণও শুরু করেন। ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্ররাই ছিল অগ্রণী। তারা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্য, ইপিআর ও পুলিশের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়ে এবং জনগণকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। তখন ছাত্ররা দলে দলে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোতে যোগ দেয়। ভারতীয় ক্যাম্পগুলোতে বহু ছাত্রকে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে হালকা অস্ত্রে সজ্জিত করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। ওই ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারা নিরন্তর গেরিলা অপারেশনে অংশ নিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে স্বল্পসংখ্যক সৈনিক নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা থেকে একটি বিশাল মুক্তিবাহিনী তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ছাত্রের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে। যুদ্ধে যাওয়ার সময় এদেশের অসংখ্য ছাত্র বাবা-মাকে এই বলে বিদায় জানিয়েছিল যে, দেশ স্বাধীন করে মায়ের কোলে ফিরে আসবে। আবার বহু ছাত্র-যুবক বাড়িতে না বলে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। তাদের অনেকেই আর ঘরে ফেরেনি। তাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৬ মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অনন্য অবদান রেখেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে হামলা চালিয়ে ছাত্রীদের নির্বিচারে হত্যা করে এবং অনেককে ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাকিস্তানি হায়নাদের হাতে সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে অনেক ছাত্রী রোকেয়া হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয়। নারীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় ২৫ মার্চ পরবর্তী সময়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে মরদেহ সরানোর কাজে নিয়োজিত সুইপারদের বক্তব্যে।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ

দেশের সংকটময় মুহূর্তে সারাদেশেই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন সামরিক অপারেশনে অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতার পদ্মপুকুর ও পার্ক সার্কাস এলাকায় মুজিবনগর সরকারের অনুমোদিত একমাত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিল 'গোবরা ক্যাম্প'। এখানে ৪০০ মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আগরতলায় মহিলা গেরিলা ট্রেনিংয়ে ৮ জন মহিলা আধুনিক অস্ত্রে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। নারীরা প্রধানত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সরবরাহ করে, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা করে, মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। যারা জীবনবাজি রেখে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুড়িগ্রামের তারামন বিবি, বরিশালের করুণা বেগম, শোভা রানী, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সাহানা, শোভা, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, মেহেরুননেছা, যশোরের সালেহা বেগম, পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম, সুনামগঞ্জের চাঁদ পেয়ারা, ডা. সিতারা বেগম, ভানেছা বেগম প্রমুখ। তারামন বিবি এবং ডা. সিতারা বেগমকে মুক্তিযুদ্ধে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু এদেশের অসংখ্য নারী পিতা, স্বামী বা সন্তান হারিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে এদেশে কয়েক লক্ষ নারী সম্ভ্রম হারান, যাদের বঙ্গবন্ধু নিজ কন্যা সম্বোধন করে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেন। কিন্তু এদের অনেকেই পরবর্তীতে পরিবার ও সমাজে নিগৃহীত হয়ে হয় আত্মহত্যা করেছেন, কিংবা নিজ নিজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৭ মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অংশগ্রহণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। বাঙালি মুক্তিবাহিনীর একটি বড় অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। এ শ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই মুক্তিযুদ্ধ একটি সত্যিকার 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হয়। তারা ঝুঁকির মধ্য থেকে লড়াই করেছেন। তাদের ছদ্মবেশের ফলে পাকিস্তানি বাহিনীকে অহরহ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। প্রায়ই দেখা গেছে, একজন কৃষক ঝোপঝাড়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে নিতান্ত নিরীহ চেহারা নিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে আর মাথায় 'মাথাল' নিয়ে মাঠে কাজ করছেন, পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে হানাদার বাহিনী। হানাদার বাহিনী একটু দূরে চলে যাওয়ার পরই তিনি 'মাথাল' ফেলে লুকানো অস্ত্র বের করে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্রুত খবর দেন। তারপর অতর্কিত হামলা করে হত্যা করেন অনেক নরপশুকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে আর হানাদার বাহিনীর অবস্থানের অগ্রিম খবর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন প্রতিনিয়ত। তাদের এমন সহায়তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে সফল হওয়া অসম্ভব ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল

মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবীদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক-চিকিৎসক-আইনজীবী-প্রকৌশলী-ব্যবসায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শিদ, ড. হাসান ইমাম, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মুজাফফর চৌধুরী প্রমুখ বিশ্ব জনমত সংগঠিত করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এ আর মল্লিক পুলিশ, ইপিআর এবং ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করেছিলেন।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বাঙালি অফিসাররা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে বাংলাদেশের এই প্রথম সরকারের প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাদের অনেকে শরণার্থী শিবিরগুলোতেও রাতদিন কাজ করেছেন। বাঙালি সামরিক অফিসাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলেন। কর্নেল ওসমানী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। তার নেতৃত্বে তখনকার মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশাররফ তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গড়ে তোলেন। কর্নেল তাহের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং দেন।

মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর ৮ জন সাব-মেরিনার পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাদের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (বীরশ্রেষ্ঠ) পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান নিয়ে পালিয়ে আসার সময় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। বিদেশেও পাকিস্তান মিশনগুলোর বাঙালি কূটনীতিকরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে বিশ্বজনমত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনতে কাজ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদান কম নয়। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা তাদের বক্তব্য বা লেখনীর মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করে বিশ্ব জনমতকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত করেন। পাকিস্তান বেতারের বাঙালি শিল্পীরা দেশত্যাগ করে কলকাতায় মিলিত হন এবং সবাই মিলে চালু রাখেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এ বেতার থেকে দেশাত্মবোধক গান, কথিকা, গণসঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রচার করে বেতার শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস যেভাবে বাঙালি জনমতকে চাঙ্গা রেখেছিলেন তা অনবদ্য।

স্বাধীন বাংলা বেতারের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলো ছিল অগ্নিশিখা, রণভেরী, রণাঙ্গনের সংবাদ, জল্লাদের দরবার, দর্পণ, বিশ্বজনমত ও 'চরমপত্র। এম আর আখতার মুকুলের ব্যঙ্গাত্মক 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। এ অনুষ্ঠানের সংলাপগুলো বাঙালির মুখে মুখে ফিরত। স্বাধীন বাংলা বেতারে যেসব বুদ্ধিজীবী নিয়মিত অনুষ্ঠান করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, গাজীউল হক, সৈয়দ আলী আহসান, রণেশ গুপ্ত, অধ্যাপক আবুল হাফিজ, মহম্মদ মুসা, ফয়েজ আহমেদ প্রমুখ। এ বেতারে সানজিদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, বেগম মুশতারী শফি, লায়লা হাসান, আইভী রহমান, সুমিতা দেবী, ড. নুরুন্নাহার জহুর, ঝুমু খান, করুণা রায়, নমিতা ঘোষ, পারভীন হোসেন প্রমুখ সংগীত, নৃত্য, কথিকা, সংবাদ, নাটক পরিবেশন করেছেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৮ মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহন

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহন

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই গণমাধ্যমকর্মীরা একটি অনন্য অবদান রাখেন। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রের শিল্পী-প্রকৌশলীরা বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' স্থাপন করেন। সে বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমেই দেশবাসী ও বিশ্ববাসী জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তারা আরও জানতে পারে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে এবং বাঙালি সৈনিকরা এই সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছে। এ সংবাদ সারা দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তর করা হয়। প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ বেতার কেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের খবরসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এর মধ্যে এম আর আখতার মুকুলের ব্যঙ্গধর্মী অনুষ্ঠান 'চরমপত্র' তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। বিবিসি এবং ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর

গণমাধ্যমে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের খবর

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

কলকাতা কেন্দ্রও নিয়মিত মুক্তিযুদ্ধের খবর পরিবেশন করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশকিছুসংখ্যক পত্রপত্রিকা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রণাঙ্গণের খবরাখবর সংগ্রহ করে প্রচার করে। পাকিস্তানি গণমাধ্যমের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এ সব পত্রপত্রিকা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত ঘটনা, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের সংবাদ প্রচার করে জাতিকে প্রেরণা যোগায়। এভাবে গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র। ১৯৭১ সালের ১১ মে থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এছাড়া বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের প্রচারের মুখপত্র হিসেবে ছিল Bangladesh। এটি ৩০ জুন, ১৯৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল সাধারণ মানুষের। এ কারণে একে মূলত একটি জনযুদ্ধ বলা হয়। সাধারণ মানুষ দীর্ঘ নয় মাস দেশের মধ্যে অবরুদ্ধ থেকে প্রতি মুহূর্তে জীবনহানি, স্ত্রী-কন্যাদের সম্ভ্রমহানির হুমকির মধ্যে থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও রসদ সরবরাহ করে, হানাদার বাহিনীর খবরাখবর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তুলেছিল। তারা একদিকে পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে তটস্থ থেকেছে, অপরদিকে তাদের এদেশীয় দোসরকুখ্যাত রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন-লুটতরাজের ভয়ে আতঙ্কে জীবনযাপন করেছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। এসব সহযোগিতার খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। অনেক লোকের লাশও তার স্বজনরা খুঁজে পায়নি। পিতার সামনে কন্যাকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, সন্তানের সামনে মাকে পাশবিক নির্যাতন করা ছিল প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার।

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ০৯ বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

অসহযোগ আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির দুই সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং তাজউদ্দীন আহমদ- এই ৪ জনকে নিয়ে আওয়ামী লীগের হাই কমান্ড গঠন করেছিলেন। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে ঢাকার অদূরে একটি গ্রামে পরবর্তী নির্দেশ গ্রহণের জন্য অবস্থান করতে বলেছিলেন। কী তার উদ্দেশ্য ছিল তা জানা যায়নি।

অনেকে মনে করেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে তিনি সশরীরে থেকে নেতৃত্ব দেবেন। এ জন্য তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে গোপনে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু পরে কৌশল হিসেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই গ্রেফতার হন। অনেক পর্যবেক্ষক বলেন, বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, তাকে না পেলে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। এজন্য সবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ধানমন্ডির বাড়ি ছেড়ে পালাতে অস্বীকার করেন। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সর্বশেষ কথা বলা কেউ কেউ এরকম কথাই বলেছেন।

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

২৫ মার্চ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এমন প্রেক্ষাপটে তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে ১ এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সহায়তায় দিল্লি পৌছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করা। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ জানান, পাকিস্তানি সেনাদের হামলা শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে সরকার গঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগ দেওয়া তার সব প্রবীণ সহকর্মীই মন্ত্রিসভার সদস্য।

ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের সংবাদ ছাড়া তার অন্যান্য সহকর্মী সম্পর্কে কিছু জানতেন না। এ কারণে তাজউদ্দীন দিল্লিতে সমবেত দলীয় প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে পরিচয় দেন। ইন্দিরা গান্ধী সে বৈঠকেই বাংলাদেশ সরকারকে মুক্তিযুদ্ধে সম্ভাব্য সব রকম সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। এর ফলে ভারত সরকার তার বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত খুলে দেয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় এলাকায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয়। এরপর তাজউদ্দীন আহমদ আখাউড়া সীমান্তের ওপারে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় চলে যান। সেখানে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ইতোমধ্যেই জড়ো হয়েছিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তারা একটি সরকার গঠনে একমত হন।

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় যদিও তিনি পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি ছিলেন, পুরো নয় মাস তার নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন। চার বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (পরে নাম হয় মওলানা আজাদ কলেজ) থেকে আইএ এবং ১৯৪৭সালে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি শুরু করেন।

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫)

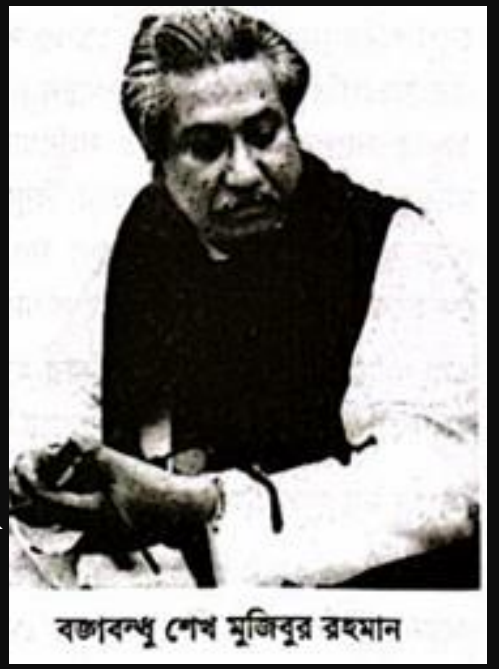
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরে একই বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়াসংক্রান্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুসহ আরো পাঁচজনকে জরিমানা করা হয়। তিনি জরিমানা এবং মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পরিচালিত ভাষা আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ যে ধর্মঘট হয় তাতে অংশগ্রহণের কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ভাষা দিবস উদযাপনের সময় আবার গ্রেফতার হন তিনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ফরিদপুরে জেলে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন। ফলে ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরে নাম হয় আওয়ামী লীগ) সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫)

পরের দিন ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানেই ততদিনে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকরে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এর প্রতিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এক পর্যায়ে ৭ মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন। এরপর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসন শুরু করেন। নেপথ্যে চলতে থাকে পাকিস্তানিদের গণহত্যার প্রস্তুতি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতার হওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়ন করে এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে তা কার্যকর করা হয়।

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫)

স্বাধীনতার কিছুদিন পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে নানা কারণে অস্থিতিশীলতা শুরু হয়। এ অরাজকতা দূর করে শক্ত হাতে দেশ পরিচালনার স্বার্থে তিনি ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আওয়ামী লীগসহ সব দল বন্ধ করে 'বাকশাল' গঠন করেন এবং এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাকশাল হলো একটি সাময়িক ব্যবস্থা। একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীরা এতে যুক্ত ছিল। তারা তখনকার সব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করে জনগণের হতাশা ও ক্ষোভকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়।

এক পর্যায়ে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকায় নিজ বাসভবনে একদল বিপথগামী সেনা. কর্মকর্তা ও সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার এবং বাঙালি জাতির জনক।

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫-৩ নভেম্বর, ১৯৭৫)

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন ১৯৪৮-এর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। ১৯৪৯ সালে তিনি পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগ দিয়ে কর বিভাগে চাকরি লাভ করেন। কিন্তু রাজনীতি করবেন বলে ১৯৫১ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫৩ সালে 'ল' পাস করে ময়মনসিংহ আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন এরং সেইসাথে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।
১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫-৩ নভেম্বর, ১৯৭৫)

১৯৭১ সালের এপ্রিলে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতা দখলকারী সরকার সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের কয়েকজনকে কারাবন্দি করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে কয়েক মাস পর ৩ নভেম্বর সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকে সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

তাজউদ্দীন আহমদ (২৩ জুলাই, ১৯২৫-৩ নভেম্বর, ১৯৭৫)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধসহ অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তিনি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৭-৫২ সময়কালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫১-৫৩ সময়কালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। যুক্তফ্রন্ট থেকে ১৯৫৪-এর পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

তাজউদ্দীন আহমদ (২৩ জুলাই, ১৯২৫-৩ নভেম্বর, ১৯৭৫)

তিনি পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবা সম্পাদক, ১৯৬৪ সালে পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ছয়দফার আন্দোলন পরিচালনা করায় ১৯৬৬-৬৯ সময়কালে কারারুদ্ধ ছিলেন। পরে তিনি ১৯৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় গঠিত উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৭২-৭৪ বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি জাতীয় চার নেতার অন্যতম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ১০ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যে খুব খারাপ কিছু একটা করতে যাচ্ছে সবাই সে আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু তারা যে এরকম ভয়াবহ ও বর্বর গণহত্যা শুরু করবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। সম্ভবত এ কারণে একটি যুদ্ধ পরিচালনার কোনো প্রস্তুতি কারো ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ যখন বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল, তখন বাঙালি নেতৃবৃন্দ তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার গঠনসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মোটেই কালক্ষেপণ করেননি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামকে আইনগত ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ঐদিনই 'আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ' আদেশসমেত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা সনদ জারি করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছাড়া সরকার গঠন করা সম্ভব ছিল না। ঘোষণাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত) মুজিবনগর, বাংলাদেশ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

"...যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন এবং যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন এবংযেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয় এবং যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ওপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয় যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

এতদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতঃপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, কর আরোপণ ও অর্থব্যয় ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতুবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ওপর এতদ্বারা অর্পিত সমূদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের ওপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি। আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। ১১

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

টপিক – ১১ মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, শনিবার (৩ বৈশাখ ১৩৭৮) তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়ার (বৈদ্যনাথতলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা দেশি-বিদেশি ১২৭ জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অনুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। এ সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমা বর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়।

তখন মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে (১৭ এপ্রিল) বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর এবং অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে।'

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আইনসভার সদস্য ও প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী। মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানও তিনি পরিচালনা করেন।

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে . নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের নিয়ে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সমর্থন প্রদান ও অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ৪ জন নেতা ও ৫ জন গণপ্রতিনিধি নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদ মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের গঠন কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান
পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ	লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রব
ডেপুটি চিফ অব স্টাফ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে (Commander-in-Chief) নিয়োগ দেয়। এছাড়া লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রবকে চিফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফরূপে নিয়োগ প্রদান এবং সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে।

THANK YOU